জমে উঠেছে কুষ্টিয়ার পোড়াদহের ঐতিহ্যবাহী কাপড়ের হাট

কুষ্টিয়ার মিরপুর উপজেলার ঐতিহ্যবাহী পোড়াদহ কাপড়ের হাটে এখন ক্রেতা-বিক্রেতাদের ভিড়ে জমজমাট পরিবেশ বিরাজ করছে। দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে পাইকারি ও খুচরা ব্যবসায়ীরা এখানে এসে কাপড় কেনাবেচা করছেন। সপ্তাহের নির্দিষ্ট দিনে বসা এই হাটকে কেন্দ্র করে পুরো এলাকায় প্রাণচাঞ্চল্য ফিরে আসে।

স্থানীয় সূত্রে জানা যায়, পোড়াদহ কাপড়ের হাট বহু বছরের পুরোনো একটি ঐতিহ্যবাহী বাজার। প্রতি সপ্তাহে নির্ধারিত দিনে এখানে কয়েকশ ব্যবসায়ী তাদের দোকান বা অস্থায়ী স্টল নিয়ে বসেন। হাটে প্রতিদিন কয়েক কোটি টাকার কাপড় কেনাবেচা হয় বলে ব্যবসায়ীরা জানিয়েছেন।

এই হাটে শাড়ি, থ্রি-পিস, লুঙ্গি, গামছা, শার্ট-প্যান্টের কাপড়, বাচ্চাদের পোশাকসহ বিভিন্ন ধরনের তৈরি ও আধা-তৈরি পোশাক পাওয়া যায়। বিশেষ করে গ্রামাঞ্চলের খুচরা ব্যবসায়ীরা এখান থেকে পাইকারি দামে কাপড় কিনে নিজ নিজ এলাকায় বিক্রি করেন। ফলে পোড়াদহের এই হাট স্থানীয় অর্থনীতিতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখছে।

ব্যবসায়ীরা জানান, কুষ্টিয়া ছাড়াও ঝিনাইদহ, চুয়াডাঙ্গা, মেহেরপুর, রাজবাড়ীসহ পার্শ্ববর্তী বিভিন্ন জেলা থেকে ব্যবসায়ীরা নিয়মিত এই হাটে আসেন। এতে করে হাটের বেচাকেনা আরও জমে ওঠে।

এদিকে হাটের অন্যতম পরিচিত প্রতিষ্ঠান বিসমিল্লাহ বস্ত্র বিতান। দোকানে গিয়ে দেখা যায়, দোকানটিতে বিভিন্ন ধরনের শাড়ি, থ্রি-পিস ও পোশাকের কাপড় সাজিয়ে রাখা হয়েছে। ক্রেতাদের চাহিদা অনুযায়ী মানসম্মত কাপড় ও তুলনামূলক কম দামে বিক্রির কারণে দোকানটিতে ক্রেতাদের উপস্থিতিও বেশ চোখে পড়ার মতো।

বিসমিল্লাহ বস্ত্র বিতান-এর মালিক আরিফুল ইসলাম আরিফ বলেন, বর্তমানে দোকানে বেশ বেচাকেনা হচ্ছে। ক্রেতাদের মধ্যে নিত্যনতুন পোশাকের চাহিদা বাড়ছে। বিশেষ করে থ্রি-পিস, শাড়ি ও লুঙ্গির পাইকারি বিক্রি বেশি হচ্ছে।

তিনি আরও বলেন, সামনে উৎসব মৌসুমকে ঘিরে পোড়াদহ কাপড়ের হাটে

ক্রেতাদের উপস্থিতি ও বেচাকেনা আরও বাড়বে। এতে স্থানীয় ব্যবসা- বাণিজ্যের পাশাপাশি এলাকার অর্থনীতিও আরও সচল হবে।

এদিকে আশিকুল ইসলাম তার পরিবারকে নিয়ে এখানে কেনাকাটা করতে এসেছেন। তিনি জানান, এখানে পছন্দমতো মানানসই পোশাক পাওয়া যায়। দামেও বেশ সাশ্রয়ী। তাই তারা নিশ্চিন্তে এখান থেকে কেনাকাটা করেন।

মেহেদী হাসান নামের আরেক ক্রেতা বলেন, পোড়াদহ কাপড়ের হাটে তুলনামূলক কম দামে ভালো মানের কাপড় পাওয়া যায়। তাই তারা নিয়মিত এই হাটে এসে প্রয়োজনীয় পোশাকের কাপড় কিনে থাকেন।

স্থানীয় ব্যবসায়ীরা জানান, সামনে ঈদসহ বিভিন্ন উৎসবকে কেন্দ্র করে পোড়াদহ কাপড়ের হাটে বেচাকেনা আরও বাড়ার সম্ভাবনা রয়েছে। ফলে ব্যবসায়ীরা আশাবাদী, এ বছর হাটে কেনাবেচা আগের তুলনায় আরও বেশি হবে।

১৫০ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাবিত্রি, হিমসাগর আম ও মেহেরসাগর কলা

দেখতে অনেকটা চমচমের মতো, আকার লম্বা ও চ্যাপটা। খেতেও সুস্বাদু। নাম তার সাবিত্রি। সম্প্রতি মেহেরপুর জেলা প্রশাসনের আবেদনে ভৈগলিক নির্দেশক (জিআই) সনদ পেয়েছে মেহেরপুরের ১৫০ বছরের এতিহ্য এই সাবিত্রি মিষ্টি। অন্যান্য মিষ্টি চিনতে সমস্যা হলেও এক দেখাতে ‘সাবিত্রি’ চেনা যায়। এর গায়ে ‘সাবিত্রি’ লেখা থাকে। এটাই এ মিষ্টির স্বতন্ত্র বৈশিষ্ঠ্য।

জেলার দেড়শ বছরের ঐতিহ্য সাবিত্রি মিষ্টি শুরু থেকেই ধরে রেখেছে স্বাদ ও মান। এর পেছনে জড়িয়ে আছে ব্যবসায়ী ও কারিগরদের মমতা ও পেশাদারিত্ব। তিন পুরুষ ধরে মেহেরপুর শহরে এই ঐতিহ্যবাহী মিষ্টি তৈরি করে বাজারজাত করছেন বাসুদেব সাহার উত্তরসূরিরা। মিষ্ট্রির

অভাবে এখন ৩০ থেকে ৪০ কেজির বেশি মিষ্টি তৈরি করা সম্ভব হয় না বলে জানান, সাবিত্রী মিষ্টির কারিগর ও ব্যবসায়ীরা।

বাসুদেব গ্র্যান্ড সন্সের বর্তমান মালিকদের দুই ভাই এক ভাই অনন্ত সাহা বলেন, ‘সাবিত্রী’ মিষ্টি তৈরিতে ব্যবহৃত দুধ কিংবা মিষ্টি ফ্রিজে রাখা হয় না। ফ্রিজে রাখলে স্বাদ আর মান ঠিক থাকে না। প্রতিদিন সংগ্রহ করা দুধ ভারী কাঠ দিয়ে চুলায় জ্বাল করানো হয়। দিনের পুরো সময় ধরে দুধ জ্বাল দিতে হয়। সন্ধ্যার দিকে জ্বাল দেওয়া শেষ হলে তা ঠান্ডা করার জন্য রেখে দেওয়া হয়। পরের দিন সকালে ‘সাবিত্রী’ বানিয়ে বিক্রি করা হয়। প্রতিদিন মিষ্টির যে পরিমাণ অর্ডার পাই, সে অনুযায়ী দুধের পরিমাণ নির্ধারণ করা হয়।

তিনি বলেন, ‘দুধ-চিনি আর কাঠের দাম বেড়ে যাওয়া এবং সময়মতো দুধের জোগান না পাওয়ায় মাঝে মাঝে সংকট তৈরি হয়। বাপ-দাদার হাতের মিষ্টি তৈরির স্বত্ব অন্য কাউকে দিতে চাই না। যদি কেউ ভেজাল করে, তাহলে দেড়শ বছরের সুনাম ক্ষুন্ন হবে। বিষয়টি মাথায় রেখেই বহিরাগত কাউকে কাজে নেওয়া হয় না।’

অনন্ত সাহা বলেন, আমরা ‘সাবিত্রী’ ও ‘রসকদম’ মিষ্টি তৈরি করে থাকি। দুটোই মেহেরপুরের ঐতিহ্য বহন করে। প্রতিকেজি ‘সাবিত্রী’ ও ‘রস কদম’ ৫৩০ টাকা দরে বিক্রি করা হয়।

সাবিত্রী মিষ্টির নিয়মিত ক্রেতা ইয়াসির রহমান বলেন, শুধু আত্মীয়-স্বজনদের জন্য না, বাড়িতে প্রতিনিয়ত খাওয়ার জন্যও এ মিষ্টি কিনে থাকি। এর মত স্বাদ আর অন্য কোন মিষ্টিতে পাই না।

মেহেরপুরের সিনিয়র সাংবাদিক ও জেলা প্রেস ক্লাবের সাধারণ সম্পাদক মাহাবুব চান্দু বলেন, মেহেরপুরের ইতিহাস-ঐতিহ্য তুলে ধরতে গেলে ‘সাবিত্রী’ মিষ্টির নাম চলে আসে। আমরা ছোট থেকেই এই মিষ্টির সাথে পরিচিত। ব্যবসায়ী ও কারিগরের হাত বদল হলেও জৌলুস আর সুনাম এখনো ধরে রেখেছেন কারিগররা। বাসুদেব সাহা এ মিষ্টির আবিস্কারক হলেও তার দেখাদেখি এখন অনেকেই এ মিষ্টি তৈরি করে, তবে বাসুদেবের মত স্বাদ ও মান অন্যরা করতে পারে না।

জিআই সনদ প্রাপ্তি নিয়ে মাহাবুব চান্দু বলেন, সাবিত্রি, আম বা কলাই নয় মেহেরপুরের আর ও কিছু ঐতিহ্যবাহী পণ্য রয়েছে যেগুলোও জিআই সনদ পাওয়ার উপযুক্ত।

[redacted]

[redacted]

[redacted]: [redacted]

[redacted]: [redacted]

[redacted]: [redacted]

[redacted]: [redacted]

[redacted]: [redacted]

[redacted]: [redacted]

[redacted]: [redacted]

[redacted]: [redacted]

[redacted]: [redacted]

হিমসাগর আম

সাবিত্রি মিষ্টির সাথে মেহেরপুরের দুটি কৃষি পণ্য হিসেবে হিমসাগর আম ও মেহেরসাগর কলাও পেয়েছে জিআই সনদ। মেহেরপুর জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের আবদনে এ দুটি কৃষিপণ্যকে জিআইসনদ দেওয়া হয়েছে। স্বাদে গন্ধে মেহেরপুরের হিমসাগর আম সারাদেশে আমপ্রেমিদের মন জয় করেছে অনেক আগে। একটি স্বাভাবিক আমের ওজন ২৫০ থেকে ৩৫০ গ্রাম হয়ে থাকে যার ৭৭ শতাংশই হল রসালো অংশ, বাকি ২৩ শতাংশ আঁটি। আঁশবিহীন আম হিসেবেও এর কদর অনেক। বাগানে বাগানে হিমসাগর আম গাছের ছড়াছড়ি। গত কয়েকবছর ধরে মেহেরপুরের হিমসাগর আম মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশে রপ্তানি করা হয়েছে। রপ্তানিযোগ্য করে উৎপাদন করতে পারলে হিমসাগর আম রপ্তানিতে গুরত্বপূর্ণ ভুমিকা রাখতে পারবে।

মেহেরপুর জেলা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবীদ সনজীব মৃধা কালের কণ্ঠকে বলেন, মেহেরপুর জেলা ২৫০ হেক্টর জমিতে আম চাষ হয়। এসকল আমচাষ থেকে ফলন হয় ৪০ হাজার মেট্রিক টন। টাকার মূল্যে ১২০ কোট টাকার আম উৎপাদন হয় প্রতিবছর।

তিনি আরও বলেন, মেহেরপুরের হিমসাগর আম অন্যরকম বৈশিষ্ঠ হলো এটিতে কোন আঁশ নেই এবং খুবই সুস্বাদু। যা অন্যান্য জেলার হিমসাগর আম থেকে আলাদা করে চেনা যাবে। চলতি বছর থেকে যাতে আমাদের হিমসাগর আম রপ্তানিতে ভালো বাজার পেতে পারে সে ব্যাপারে চাষীদের সাথে আমরা ইতিমধ্যে কাজ শুরু করেছি।

মেহেরপুরের সব থেকে বড় হিমসাগর আম চাষী শহরের মহিলা কলেজ পাড়ার সাইদুর রহমান শাহিন সদর উপজেলার সুবিধপুরে তাঁর ৩০ বিঘা জমিতে ১৭৭টি হিমসাগর আমের বাগান রয়েছে। তিনি বলেন, ২০১৬ সাল থেকে আমি হিমসাগর আম রপ্তানি করার লক্ষ্যে কৃষি অফিসসহ সরকারের বিভিন্ন দপ্তরের সাথে কাজ করছি। ২০১৭ সালে আপনি কালের কণ্ঠ পত্রিকায় আমাদের হিমসাগর আম নিয়ে বড় প্রতিবেদন করেছিলেন। এছাড়াও বেশ কয়েকটি পত্রিকায় প্রতিবেদন হয়। এসকল প্রতিবেদন গুলো সাবেক কৃষি সম্প্রসারণ উপপরিচালক বিজয় কষ্ণ হালদার অফিসিয়াল খরবে জিআই সনদের জন্য আবেদন করেছিলেন। অবশেষে আমরা সেই জিআই সনদ পেলাম। এটা আমাদের জন্য অত্যান্ত আনন্দের। আমরা এই হিমসাগর নিয়ে আরও কাজ করতে পারবো।

মেহেরসাগর কলা

মেহেরপুর সবজির পাশাপাশি চাষীরা ব্যাপকভাবে বিভিন্ন জাতের কলা চাষ করে থাকেন। তার মধ্যে ঐতিহ্যবাহী কলা হচ্ছে মেহেরপুর সাগর। জেলা প্রতিবছর গড়ে ৩০০ হেক্টর জমিতে কলা চাষ করা হয়ে থাকে। তার মধ্যে অধিকাংশ কলা মেহের সাগার জাতের। সুস্বাদু জাতরে কলা যার গাছ মজবুত, ফলন ভালো হয় এবং রোগবালাই কম হওয়ায় মহেরেপুর সাগর কলা চাষীদরে কাছে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে।◌ে এবং এটি লাভজনক ফসলে পরণিত হয়ছে।

মেহেরপুরের মুজিবনগর উপজেলার শিবপুর গ্রামের কলাচাষী সানোয়ার হোসেন বলেন, মেহের সাগর কলা সুস্বাদু এবং এটি লাভজনক ফসল। এ ফসল চাষের পাশাপাশি সাথি ফসল চাষ করা হয়। তিনি বলেন, আমি ৭ বিঘা জমিতে মেহেরসাগর কলা চাষ করেছি। শুরু থেকে ফসল হার্ভেস্টিং পর্যন্ত এক বছর সময় লাগে। এর মধ্যে ৬ মাসের একটি সাথী ফসল চাষ করা যায়। সব মিলিয়ে যে খরচ হয় তা সাথী ফসলে উঠে আসে। আশা করছি ৭ বিঘা জমি থেকে বছর শেষে আনুমানিক ১০ লাখ টাকা লাভ হবে।

সানোয়ার হোসেন বলেন, মেহেরপুরের কলা উৎপাদন দেখে আশেপাশের বিভিন্ন জেলা থেকে আমাদের কাছে থেকে চারা নিয়ে যাচ্ছেন কয়েকবছর ধরে। কিন্তু আমাদের মত তারা ফলন পাচ্ছে না। যে কারণেই মেহেরপুরের জন্য মেহের সাগর বিখ্যাত হয়ে উঠেছে। নতুন করে জিআই সনদ পাওয়ায় এর কি সুফল আমরা পাবো সেবিষয় এখনো পরিস্কার হতে পারিনি । তবে আশা করছি চাষীরাও উপকৃত হবে।

মেহের সাগর কলা নিয়ে মেহেরপুর কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপপরিচালক কৃষিবীদ সনজীব মৃধা বলেন, মেহেরপুরে কলা চাষের একটি বড় বাজার রয়েছে। বছরের ১৫০ কোটি টাকা কলা বাজার জাত হয়েছে। ৩০০ হেক্টর জমিতে কলার চাষ হয় যা থেকে উৎপাদন হয় ১ লাখ ৫০ হাজার মেট্রিক টন কলা।

সনজীব মৃধা বলেন, যেহেতু আমরা কলা নিয়ে জিআই সনদ পেয়েছি। এখন এটা নিয়ে যাতে কৃষকরা ভালো বাজার পান সে বিষয়ে কাজ করা হবে।

গাংনীতে ৬ লাঠিয়াল দলের নজরকাড়া রণকৌশল ঐতিহ্যবাহী লাঠিখেলা

মেহেরপুরের গাংনী বাজার উন্নয়ন সংস্থার আয়োজনে দিনব্যাপি লাঠিখেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে। আজ সোমবার সকাল থেকে গাংনী ফুটবল মাঠে খেলার উদ্বোধন করেন মেহেরপুর জেলা বিএনপির সভাপতি জাভেদ মাসুদ মিল্টন।

কালের বিবর্তনে সামন্ত প্রভুদের খাজনা আদায়ের লাঠিয়ালদের সেই নিষ্ঠুরতা এখন মানুষের বিনোদন যোগাচ্ছে। লাঠিয়ালদের কলা-কৌশলও বেশ নজরকাড়া। প্রতিপক্ষকে পরাস্ত করতে নানা কৌশলে লাঠি চালাচ্ছেন একপক্ষ। অন্যপক্ষও আত্মরক্ষার্থে অবলম্বন করছেন নানা কৌশল। এ যেন আনন্দদায়ী পাতানো এক যুদ্ধ! হারিয়ে যাওয়া গ্রাম বাংলার এই ঐতিহ্যবাহী পাতানো যুদ্ধে মুগ্ধ হয়েছেন গাংনীর হাজারও দর্শক।

খেলার শুরুতেই বাদ্যের তালে তালে লাঠিয়ালদের নাচ, আক্রমণ ও প্রতিরক্ষামূলক কসরত যেন দর্শককে বিমোহিত করেছে। লাঠিখেলাকে কেন্দ্র করে গাংনীতে যেন সৃষ্টি হয়েছে এক লোকজ উৎসবের আমেজ, যেখানে জড়ো হয়েছে হাজারও বৃদ্ধ, নারী, পুরুষ ও শিশু। এ যেন আনন্দদায়ী পাতানো এক যুদ্ধ! হারিয়ে যাওয়া গ্রাম বাংলার এই ঐতিহ্যবাহী পাতানো যুদ্ধে মুগ্ধ হয়েছেন গাংনীর হাজারও দর্শক।

খেলার আয়োজকরা জানিয়েছেন, ঐতিহ্যবাহী লাঠিখেলাকে পুনরুদ্ধার করে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বন্ধনকে সুদৃঢ় করা এবং সুস্থ ধারার সামাজিক বিনোদন প্রদান, মাদক ও জুয়ামুক্ত সমাজ গড়ার প্রত্যয়ে এই খেলাটির আয়োজন করা হয়েছে।

গাংনী বাজারপাড়া উন্নয়ন সংস্থার সভাপতি সোহানুর রহমান সোহান বলেন, জনপ্রিয় এই খেলাটি এখন বিলুপ্তপ্রায়। তরুণ প্রজন্মকে মাদক ও মোবাইল আসক্ত থেকে মুক্ত রেখে শরীরচর্চায় আগ্রহী করতে খেলাটি বিশেষ ভূমিকা রাখবে। এছাড়াও তিনি খেলাটি টিকিয়ে রাখতে সকলকে পৃষ্ঠপোষকতার আহ্বান জানান।

স্কুল ছাত্রী রোমানা খাতুন বলেন, আমি কখনো লাঠিখেলা দেখিনি।

জেলা যুবদলের সাধারণ সম্পাদক কাওছার আলী।

খেলা শেষে বিজয়ী ও রানার্সআপ দলের মধ্যে প্রধান অতিথি পুরস্কার বিতরণ করেন।

দামুড়হুদার ডুগডুগি গ্রামে বিষধর সাপ নিয়ে ঐতিহ্যবাহী ঝাপান খেলা

বিষধর সাপ দেখে মানুষ ভয় পায়, অথচ সেই সাপ নিয়েই আবার খেলা দেখিয়ে মানুষকে আনন্দ দিতে পারেন কেউ কেউ। এরকমই একটি খেলা হচ্ছে গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী ঝাপান খেলা। দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের ডুগডুগি গ্রামে হয়ে গেল গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী বিষধর সাপ নিয়ে ঝাপান খেলা।

বৃহস্পতিবার ডুগডুগি গ্রামের মৃত আজির মণ্ডলের স্ত্রী রোকেয়া বেগমের আয়োজনে সকাল ৯টা থেকে দিনভর উপজেলার তারিনীপুর গ্রামের নজু সাপুড়ের দল এবং মেহেরপুর থেকে আগত এক সাপুড়িয়ার দল খেলা দেখায়। এই দুই সাপুড়ে দলের অর্ধশতাধিক সাপের মধ্যে নিজেদের সেরা প্রমাণ করতে প্রতিটি সাপ প্রদর্শন করে আকর্ষণীয় কলাকৌশলে। আর এ দুর্লভ দৃশ্য দেখতে দূর-দূরান্ত থেকে ছুটে আসেন দর্শনার্থীরা। মানুষকে আনন্দ দেওয়াটাই যেন সাপুড়েদের মূল উদ্দেশ্য।

দুপুরের পর থেকেই ঝাপান খেলা দেখতে দামুড়হুদা উপজেলার হাউলী ইউনিয়নের ডুগডুগি গ্রামে ভিড় জমায় শত শত মানুষ। বাদ্যের তালে তালে সাপুড়ে নিজে নাচেন, আর সঙ্গে ফণা তুলে সাপও বিভিন্ন অঙ্গভঙ্গি প্রদর্শন করে। সাপুড়ের ইশারায় সাপের এই অঙ্গভঙ্গি মানুষকে দেয় অনাবিল আনন্দ। তাই এই দুর্লভ দৃশ্য দেখতে দূর-দূরান্ত থেকে ছুটে আসেন দর্শনার্থীরা।

হাউলী থেকে আসা শাপলা খাতুন নামের এক গৃহবধূ বলেন, আমি জীবনের প্রথম ঝাপান খেলা এখানে এসে দেখছি। আমার খুব ভালো লেগেছে। আমি

চাই এ ধরনের আয়োজন যেন প্রতি বছর করা হয়। সালেহা বেগম নামের অপর এক গৃহবধূ বলেন, আমি শহরে থাকি। ঝাপান খেলার কথা শুনে আমার বাচ্চাদের নিয়ে এসেছি। আমিও দেখছি, আমার বাচ্চারাও দারুণ উপভোগ করছে। সাপ সম্পর্কে ওদের ধারণা হচ্ছে।

হাউলী ইউনিয়নের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান নিজাম উদ্দিন বলেন, গ্রামবাংলার প্রাচীন ঐতিহ্য নতুন প্রজন্মের জন্য টিকিয়ে রাখতে পৃষ্ঠপোষকতার প্রয়োজন। বৈরী আবহাওয়া উপেক্ষা করে শিশু থেকে শুরু করে সব বয়সী দর্শকরা তা উপভোগ করেছে নীরবতায়। ঝাপান খেলা বা সাপ খেলা একটি গ্রামীণ ঐতিহ্যের অংশ, যা একসময় গ্রামবাংলায় বিভিন্ন দিবস বা ঘরোয়া আয়োজনে দেখানো হতো। কিন্তু প্রযুক্তি আর আধুনিকতার ছোঁয়ায় দিন দিন এসব খেলা হারিয়ে যাচ্ছে। তাই এই হারিয়ে যাওয়া ঐতিহ্যকে টিকিয়ে রাখতে প্রয়োজন এমন আয়োজন।

দামুড়হুদার হাউলী ইউনিয়নের তারিনীপুর গ্রাম থেকে আসা নজরুল ইসলাম ওরফে নজু সাপুড়ে বলেন, মূলত আমাদের পেশা এটা নয়। আমরা মানুষকে আনন্দ দিই, আর খেলা করে নিজেরাও আনন্দ পাই। এ জন্যই দেশের বিভিন্ন স্থানে গিয়ে ঝাপান খেলা করি।

জয়রামপুর গ্রামের নুর নবী বলেন, বিভিন্ন এলাকা থেকে বয়োবৃদ্ধ, নারী-পুরুষ, শিশুরা উপস্থিত থেকে নিবিড় দৃষ্টিতে সাপের খেলা উপভোগ করেন। এই খেলাকে ঘিরে এখানে সৃষ্টি হয় উৎসবের আমেজ। গ্রামবাংলার ঐতিহ্য যে এত মনোমুগ্ধকর, ঝাপান খেলা না দেখলে বোঝা যাবে না।

আয়োজকের ছেলে হামিদুল ইসলাম বলেন, চিরায়ত বাংলার ঐতিহ্যবাহী এই খেলা দিন দিন হারিয়ে যেতে বসেছে। হারিয়ে যাওয়া এই ঐতিহ্য ধরে রাখতে এবং এলাকার মানুষকে আনন্দ দিতেই এ আয়োজন।

গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী বিষধর সাপ নিয়ে ঝাপান খেলাটির আয়োজন করেন হাউলী ইউনিয়নের ডুগডুগি গ্রামের মৃত আজির মণ্ডলের স্ত্রী রোকেয়া বেগম।

[redacted]

[redacted]

জমে উঠেছে ঐতিহ্যবাহী বামন্দী পশুহাট

আসন্ন কোরবানিকে সামনে রেখে মেহেরপুর গাংনী উপজেলার ঐতিহ্যবাহী বামন্দী পশুহাটে ক্রেতা-বিক্রেতার ভিড় শুরু হয়েছে। প্রায় ২০০ বছরের পুরনো এই হাটটি মেহেরপুর জেলার ঐতিহ্য বহন করে আসছে।

এই পশুহাটে দেশের বিভিন্ন জেলা থেকে আসেন ক্রেতা ও ব্যবসায়ীরা। ব্যবসায়ীরা গরুর দড়ি ধরে আছেন ক্রেতার আশায়, আবার ক্রেতারাও কোরবানির জন্য খুঁজছেন নিজেদের পছন্দমতো গরু, ছাগল ও ভেড়া। জেলার চাহিদা পূরণ করে কোরবানির পশু রাজধানী ঢাকা সহ বিভিন্ন জেলায় চলে যায়। এই সময় পশু বিক্রির জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েন খামারি ও নিজ বাড়িতে পশু পালনকারীরা।

কৃষকের বাড়িতে একটি-দুটি করে লালন-পালন হলেও খামারে রয়েছে অনেক গরু, ছাগল ও ভেড়া। অনেক কৃষক শখের বসে পারিবারিকভাবে মহিষ পালন করেন।

গাংনীতে বেশ কয়েকটি ছাগল ও ভেড়ার বাণিজ্যিক খামার থাকলেও পারিবারিক খামারেও ছাগল ও ভেড়া বেশি পালিত হচ্ছে। বসতবাড়িতে দু- একটি গরু পালন করা এখন অনেক পরিবারের প্রধান কাজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। সারা বছর গরু পালনের পর এখন এসেছে বিক্রির সময়। গরু বিক্রির টাকায় মিটবে পরিবারের আর্থিক চাহিদা। বাড়তি অর্থ দিয়ে আবারও গরু কেনা হবে। এভাবেই চলে গরু পালনকারী পরিবারগুলোর চক্র।

গরু খামারি উপজেলার ষোলটাকা গ্রামের শাজাহান আলী বলেন, “শিক্ষিত বেকার যুবকরা যদি খামার করে, তাহলে বেকারত্ব দূর হওয়ার পাশাপাশি তারা স্বাবলম্বী হতে পারবে। সন্তানের মতো পরম আদর-যত্ন ও মমতায় গরুকে লালন-পালন করা হয়। খামারের গরুকে বিচালি, ঘাস, ভুট্টা, খৈলসহ প্রাকৃতিক খাবার খাওয়ানো হয়। কোনো প্রকার কেমিক্যাল ব্যবহার করা হয় না। নিজেরাই খৈল উৎপাদন করি, সেই খৈল খাওয়ানো হয়। খৈল থেকে প্রাপ্ত তেল দেশের বিভিন্ন জেলায় সরবরাহ করা হয়। ইতোমধ্যে বেশ কিছু গরু বিক্রি হয়েছে, ঈদের আগেই বাকিগুলো বিক্রির আশা করছি। চাহিদা আর ভালো দাম পেলে লাভবান হবো বলে আশা করছি।”

খামারি বালিয়াঘাট গ্রামের মোশাররফ হোসেন বলেন, “সরকার যদি

খামারিদের বিনা সুদে ঋণ দেয়, তাহলে বেকার যুবকরা এ পেশায় এগিয়ে আসবে। আমার খামারে সারা বছর গরু লালন-পালন করা হয়। এবারও বেশ কিছু গরু আছে, যেগুলোর দেখভাল করে পুরো পরিবার। আমরা ন্যায্য মূল্যে লাভের আশা করছি।”

খামারি তেরাইল গ্রামের হেলাল উদ্দিন বলেন, “পারিবারিক খামারে গরু পালন করেছি। কোরবানির জন্য পশুগুলো বিক্রি করে দেব। এখন খুব ব্যস্ত সময় পার করছি কোরবানির পশু নিয়ে। পুরুষের পাশাপাশি নারীরাও সহযোগিতা করছে পশু পালনে। গো-খাদ্যের দাম বেশি এবং তীব্র গরমে পশু পালন করা খুব কঠিন হয়ে পড়েছে।”

বামন্দী পশুহাটে গরু কিনতে আসা জিয়া হোসেন বলেন, “দীর্ঘদিন দেশের বাইরে ছিলাম। ছুটিতে বাড়ি এসেছি পরিবারের সঙ্গে ঈদ করব বলে। হাটে এসে দেখি গরু ও ছাগলের দাম অনেক বেশি। তারপরও কিনব। আজ হাটে পছন্দ না হলে আগামী হাটে আসব।”
আরেক ক্রেতা বলেন, “কোরবানির জন্য গরু কিনতে এসেছি। পছন্দ হয়েছে, তবে দাম অনেক বেশি। তারপরও কিনেছি। অনেকে এখনও পশু কেনার আগে দেখাদেখি করছে।”

ছাগল ব্যবসায়ী লালচাঁদ বলেন, “বামন্দী বাজারে বড় ছাগলের খুব চাহিদা। বিভিন্ন গ্রাম থেকে ছাগল কিনে আনছি। গ্রামের লোকজন প্রায় প্রতিটি বাড়িতে ছাগল পালন করে এবং কোরবানির সময় সামনে রেখে বিক্রি করে দেয়। এবার ছাগলের দাম অনেক বেশি।”

গরু ব্যবসায়ী জোরপুকুর গ্রামের জামরুল বলেন, “এবার গরুর বাজারদর ভালো রয়েছে। হাটে পর্যাপ্ত গরু উঠেছে এবং গরুর চাহিদাও অনেক। আশেপাশে বামন্দীর মতো বড় হাট আর নেই। দেশের বিভিন্ন জায়গা থেকে ব্যবসায়ী ও ক্রেতারা আসেন এই হাটে।”

বামন্দী পশুহাটের ইজারাদার, সাবেক চেয়ারম্যান আব্দুল আউয়াল বলেন, “বামন্দী পশুহাট মেহেরপুর জেলার ঐতিহ্যবাহী একটি হাট। প্রায় দুই শত বছরের পুরনো এই হাট জেলার গর্ব। সপ্তাহে দু’দিন, সোমবার ও শুক্রবার, হাট বসে। কেউ যাতে প্রতারণার শিকার না হয়, সেজন্য আমরা সবসময় নিরাপত্তা নিশ্চিত করার চেষ্টা করি। এ বিষয়ে প্রশাসনও তৎপর রয়েছে। কোরবানিকে সামনে রেখে সব ধরনের পশুর বেচাকেনা শুরু হয়েছে।”

মেহেরপুর গাংনী উপজেলা প্রাণিসম্পদ অফিস সূত্রে জানা গেছে, উপজেলায় কোরবানিযোগ্য পশু রয়েছে ১,৪০,৮৩৮টি। এর মধ্যে গরু

৪১,৫৭৮টি, ছাগল ৯৬,৮৪৫টি, মহিষ ৩৮৫টি এবং ভেড়া ২,০৩০টি। উপজেলায় কোরবানির চাহিদা রয়েছে প্রায় ৪২ হাজার পশুর।
গাংনী উপজেলা প্রাণিসম্পদ কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) মো. আরিফুল ইসলাম বলেন, “গাংনী উপজেলায় যে কোরবানিযোগ্য পশু প্রস্তুত রয়েছে, তা উপজেলার চাহিদা মিটিয়ে দেশের বিভিন্ন এলাকার কোরবানির পশুর চাহিদা পূরণে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখবে। অর্থাৎ, চাহিদার চেয়ে অনেক বেশি পশুর যোগান রয়েছে।”

তিনি আরও বলেন, “মেহেরপুরের গাংনী উপজেলায় সবচেয়ে বড় পশুহাট হচ্ছে বামন্দী। সপ্তাহে দুই দিন, শুক্রবার ও সোমবার, এই হাট বসে। হাটে কোনো পশু অসুস্থ হয়ে গেলে চিকিৎসা দেওয়ার জন্য আমাদের মেডিকেল টিম সেখানে মোতায়েন রয়েছে।”

গাংনী উপজেলা নির্বাহী কর্মকর্তা আনোয়ার হোসেন বলেন, “ঈদকে সামনে রেখে যাতে কোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে, সেজন্য বামন্দী পশুহাটে পর্যাপ্ত পুলিশ, প্রশাসনের নজরদারি, জাল নোট সনাক্তকরণ মেশিনসহ সব ধরনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।”

মেহেরপুরের কুতুবপুরে ঐতিহ্যবাহী মহরমের মেলা অনুষ্ঠিত

মেহেরপুরের কুতুবপুর ইউনিয়নের কুতুবপুর গ্রামে প্রতিবছরের ন্যায় এবারেও মহরমের মেলা অনুষ্ঠিত হয়েছে।

মহররম’ শব্দের অর্থ সম্মানিত। ইসলামের ইতিহাসে এই মাসের সঙ্গে অনেক স্মৃতি জড়িয়ে আছে। এসব স্মৃতির সম্মানার্থে এই মাসকে মহররম বা সম্মানিত বলে আখ্যায়িত করা হয়েছে। কোরআনুল কারিমে রয়েছে, ‘আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকেই আল্লাহর কাছে মাসের সংখ্যা ১২, এর মধ্যে ৪টি মাস (মহররম, রজব, জিলকদ, জিলহজ) আর মহরম মাসের ১০ তারিখ কে আশুরার দিন বলা হয়েছে।

ঝিনাইদহে ঐতিহ্যবাহী গরুর গাড়ির দৌড় ও গ্রামীন মেলায় মানুষের ঢল

আবহমান কাল থেকে কৃষকের হালচাষের একমাত্র ভরসা ছিল গরু। আর মাঠ থেকে কৃষি পণ্য বহনের জন্য ব্যবহার করা হতো গরুর গাড়ি। কালের বির্বতনে সে সবের পরিবর্তে এখন শুরু হয়েছে যান্ত্রিক চাষাবাদ ও পরিবহন ব্যবস্থা। এখনো সেই পুরাতন ঐতিহ্যকে ধরে রাখতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে বছরের এই সময়ে কৃষকের গরু এবং গরুর গাড়ি নিয়ে গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী গরুর গাড়ির দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয় সাথে আয়োজন করা হয় গ্রামীন মেলার।

জোয়াল কাঁধে দেওয়ার পর কর্তার হাতের ছোঁয়ায় যেন মুহূর্তে পাল্টে যায় চরিত্র। একে অপরকে পেছনে ফেলতে ছুটতে থাকে বিদ্যুৎ গতিতে। যা দেখে উচ্ছসিত হাজার হাজার দর্শক। তেমনই এক প্রতিযোগীতা অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ঝিনাইদহ সদর উপজেলার গান্না ইউনিয়নের বেতাই গ্রামের মাঠে ।

আজ শনিবার (২০ জানুয়ারি) সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত এ দৌড় পতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। আর এই খেলাকে কেন্দ্র করে বসে গ্রামীন মেলা। মেলায় স্থান পাই মিষ্টি, মিঠাই, মেয়েদের বিভিন্ন প্রসাধনী, বাচ্চাদের জন্য ছিল নাগরদোলা ও চরকি খেলা।

মেলায় গিয়ে দেখা যায়, প্রত্যন্ত পল্লী ঝিনাইদহ সদর উপজেলার বেতাই গ্রামের মাঠ । ঘনকুয়াশা, বৈরী আবহাওয়া ও প্রচন্ড শীত উপেক্ষা করে আশেপাশের জেলাসহ কয়েক হাজার মানুষ জড়ো হয়েছে শুধুমাত্র গ্রামীণ ঐতিহ্যবাহী ব্যতিক্রমী গরুর গাড়ির দৌড় প্রতিযোগীতা ও গ্রামীণ মেলা উপভোগ করতে। বেতাই মাঠ জুড়ে যেন উৎসবে পরিণত হয়। আমন মৌসুমের ধান কাটার পর ফাঁকা মাঠে এই গরুর গাড়ির দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হয়। গরুর গাড়ির এমন রোমাঞ্চকর প্রতিযোগিতা দেখতে আশপাশের কয়েক গ্রামের নারী, পুরুষ ও শিশুরাও অত্যন্ত উৎসাহ নিয়ে সকাল থেকে মাঠে উপস্থিত হয়। দুর-দুরান্ত থেকেও দর্শনার্থীদের উপচে পড়া ভিড় লক্ষ্য করা গেছে। এছাড়াও বিভিন্ন খাবারের দোকান ও শিশুদের জন্য নাগরদোলাসহ বিভিন্ন স্টল বসেছিল মাঠটিতে।

উপজেলার মিরাজ হোসেনকে ১ম পুরুস্কার হিসেবে ২০ হাজার টাকা, যশোরের জোড়াদাহ থেকে আয়ুব হোসেন ২য় হওয়ায় তাকে ১৫ হাজার টাকা এবং চুয়াডাঙ্গা জেলার জীবননগর গঙ্গারামপুর মিয়ারাজ ৩য় হওয়ায় তাকে ১০ হাজার টাকা পুরস্কার দেওয়া হয়েছে। এছাড়াও অংশগ্রহণকারী সবাইকে শান্তনা পুরুস্কার হিসেবে ২ হাজার টাকা করে দেওয়া হয়েছে।

গরুর গাড়ির দৌড় প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে ঝিনাইদহ জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক সাইদুল করিম মিন্টু বলেন, সমাজ থেকে অন্যায়, অপরাধ ও মাদক দুর করতে হলে এ ধরনের বিনোদনের কোন বিকল্প নেই। বিশেষ করে যুবসমাজকে অপরাধ থেকে দূরে রাখতে হলে, তাদের নিয়মিত খেলার মাধ্যমে বিনোদনের মধ্যে রাখতে হবে। এছাড়াও দেশের ঐতিহ্যবাহী খেলার সাথে নতুন প্রজন্মের পরিচিতি করানোর জন্য হলেও সরকারি ভাবে এইসব আয়োজন করা উচিৎ।

দামুড়হুদায় গ্রামবাংলার ঐতিহ্যবাহী দড়িটানা খেলা অনুষ্ঠিত

চুয়াডাঙ্গার দামুড়হুদায় হয়ে গেলো গ্রাম-বাংলার ঐহিত্যবাহী দড়িটানা খেলা। উপজেলার কার্পাসডাঙ্গা গ্রামে এ খেলার আয়োজন করা হয়। গ্রামের পশ্চিমপাড়া যুবসংঘের আয়োজনে শনিবার দিনব্যাপি গ্রামসংলগ্ন ভৈরব নদের তীরে এ খেলা অনুষ্ঠিত হয়। ঐতিহ্যবাহী এ খেলা দেখতে হাজারো মানুষের ঢল নামে কার্পাসডাঙ্গা গ্রামে।

আয়োজকরা জানান, খেলায় মোট ৮টি দল অংশ নেয়। শনিবার সকাল থেকে কার্পাসডাঙ্গা গ্রামের তিনটি দল, জগন্নাথপুর গ্রামের দুটি দল এবং গচিয়ারপাড়া, কোমরপুর ও আনন্দবাস গ্রামের একটি করে দল খেলায় অংশ নেয়।

শনিবার বিকালে এ সংবাদ লেখা পর্যন্ত খেলা চলমান ছিলো। আয়োজনরা জানান, খেলায় চ্যাম্পিয়ন ও রানারআপ দলকে পুরষ্কার হিসেবে একটি করে ছাগল প্রদান করা হবে।

[redacted]

[redacted]

দামুড়হুদার হাউলী ইউনিয়নের তারিনী পুর গ্রাম থেকে আসা নজরুল ইসলাম নজু সাপুড়ে বলেন, মূলত আমাদের পেশা এটা না। আমরা মানুষকে আনন্দ দিয়। আর খেলা করে আনন্দ পাই। এ জন্যই দেশের বিভিন্ন স্থানে গিয়ে ঝাপান খেলা করি।

দামুড়হুদা সদর ইউনিয়ন পরিষদের সদস্য সামসুল আলম বলেন, চিরায়ত বাংলার ঐহিত্যবাহী এ খেলা দিন দিন হারিয়ে যেতে বসেছে। হারিয়ে যাওয়া এই ঐতিহ্য ধরে রাখতে আর এলাকার মানুষকে একটু আনন্দ দিতেই এ আয়োজন।

খেলায় মেহেরপুর বলিয়ার পুর সাপুড়ে দলকে হারিয়ে দামুড়হুদার হাউলী ইউনিয়নের তারিনী পুর গ্রামের নজু সাপুরের দল প্রথম হয়।

গ্রাম বাংলার ঐতিহ্যবাহী বিষধর সাপ নিয়ে ঝাপান খেলাটি আয়োজক করেন, দামুড়হুদা সদরের বেগো পাড়ার ভানুমতি।